# রেলের ওভারহেডে কাজের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে খেলোয়াড়ের মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক

ট্রেনের প্যান্টোগ্রাফ মেরামত করার সময়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে রাজ্য ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন তৃণাঙ্কুর নাগের। এমন মর্মান্তিকভাবে তাঁর মৃত্যু হল অকালে। তাঁর বয়েস হয়েছিল মাত্র ২৫। এভাবে এক প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের মৃত্যু শুধু দুভাগ্যজনকই নয়, অভাবনীয়। তৃণাঙ্কুরের মৃত্যুতে রাজ্যের মানুষ এবং ক্রীড়ামহল অত্যন্ত শোকাহত। শনিবার দুপুরে নারকেল ডাঙা থানা এলাকায় রেলের কারশেডে এই ঘটনা ঘটে। সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনা কীভাবে ঘটল তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া দরকার। বিশেষ করে আর কখনও যাতে এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা না ঘটে তা সুনিশ্চিত করা জরুরি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষর। অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে সোমবার প্রতিভাবান এই খেলোয়াড়ের মৃত্যুর পর অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে শুরু হয়েছে তদন্ত। তদন্তে নেমে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে, এ ধরনের কাজ করার সময়ে বিশেষ ধরনের সেফটি কিট দেওয়া হয়েছিল কিনা, যাতে কাজ চলাকালীন কোনওভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকে। পাশাপাশি এই কাজের জন্য তার লাইসেন্স ছিল কি না, তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে কোনও স্তরে গাফিলতি থাকলে তার জন্য যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ



**আবির্ভাবে**

জগন্মাতার দর্শনলাভ করিয়া আনন্দাতিশয্যে ঠাকুর কয়েকদিনের জন্য একেবারে কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ দিনগুলিতে হৃদয় কোনরূপে মন্দিরে সেবাপূজা চালাইয়া নিয়াছিল অন্য এক ব্রাহ্মণের সাহায্য লইয়া, এবং মাতুলের চিকিৎসায় মন দিয়াছিল তাঁহার বায়ুরোগ হইয়াছে ভাবিয়া। বালকভাবাপন্ন ঠাকুর তাঁহার অসুখ হইয়াছে শুনিয়া চিকিৎসায় অমত করেন নাই। হৃদয়ের পূর্বপরিচিত, ভূকৈলাস রাজবাটীর চিকিৎসক এক বিজ্ঞ কবিরাজ কিছুদিন চিকিৎসাও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সেই তথাকথিত বায়ুরোগের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই। এই সময়ে পূজা বা ধ্যান করিতে গিয়া ঠাকুরের যেসব চিন্তা দর্শন, বা অনুভব হইত সেই সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ মার নাটমন্দিরের ছাদের আলিসায় যে ধ্যানস্থ ভৈরবমূর্তি আছে তাকে দেখিয়া মনকে বলতুম, ঐরকম স্থির নিস্পন্দভাবে বসে মার পাদপদ্ম চিন্তা করতে হবে। ধ্যান করতে বসা মাত্র শুনতে পেতুম, শরীরের গ্রন্থিগুলিতে, পায়ের দিক থেকে ঊর্ধ্বে খটখট করে শব্দ হচ্চে, আর একটার পর একটা করে গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হয়ে যাচ্চে—কে যেন ঐ জায়গাগুলি তালাবন্ধ করে দিচ্চে। যতক্ষণ ধ্যান করতুম ততক্ষণ শরীরটাকে একটু নেড়েচেড়ে আসন পালটাতে পারতুম না, ইচ্ছামাত্র ধ্যান ছেড়ে উঠতেও পারতুম না।

**সপ্তম অধ্যায়**

**মহাশক্তির উদ্বোধন সাধকভাবের আবেশে**

পূর্বোক্ত প্রথম দর্শনের পর, জগন্মাতার ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিবার জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। এই ক্রন্দন অন্তরে সর্বদা বিদ্যমান থাকিত, আর কখন কখন এতই বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেন 'মা, আমায় কৃপা কর্, দেখা দে' বলিয়া। চারিপাশে লোক দাঁড়াইয়া যাইত। তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্তির মত মনে হইত ও কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ তাঁহার হইত না। অসহ্য যন্ত্রণায় এক এক সময়ে সময়ে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একেবারে লোপ পাইত, আর তখনই দেখিতেন—মার বরাভয়া চিন্ময়ী মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে।

**অষ্টম অধ্যায়**

**শাস্ত্রীয়াচার উল্লঙ্ঘন রাগভক্তির**

## দিনপঞ্জিকা

**১২ অগ্রহায়ণ,** ভাঃ ৮ অগ্রহায়ণ, **২৯ নভেম্বর**, ১২ অঘোন, সংবৎ ৭ মার্গশীর্ষবদি, ২০ রবিঃ আউঃ। সূর্যোদয় ঘ ৬।০৪, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৪৭। **বৃহস্পতিবার,** সপ্তমী রাত্রি ঘ ৯।৫১ মিঃ। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ঘ ১০।২২ মিঃ।ইন্দ্রযোগ সন্ধ্যা ঘ ৫।৫ মিঃ।বৃষ্টিকরণ, দিবা ঘ ১১।২ গতে ববকরণ, রাত্রি ঘ ৯।৫১ গতে বালবকরণ। **জন্মে**-- কর্করাশি বিপ্রবণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ঘ ১০।২২ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**— একপাদদোষ রাত্রি ঘ ৯।৫১ গতে দোষনাই। **যোগিনী**— বায়ুকোণে, রাত্রি ঘ ৯।৫১ গতে ঈশানে। **কালবেলাদি** ঘ ২।৬ গতে ৪।৪৭ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১১।২৬ গতে ১।০ মধ্যে। **যাত্রা**-- নাই। **শুভকর্ম্ম**-- দিবা ঘ ১০।২২ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য গোবিক্রয়াদি, দিবা ঘ ৯।৫০ গতে ২।৬ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন ভূমি ক্রয়-বিক্রয়, দিবা ঘ ১০।২২ গতে ২।৬ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন। **বিবিধ**— সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ৯।৫১ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা। শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের আর্বিভাব তিথি উপলক্ষ্যে পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠান। অমৃতযোগ**-- দিবা ঘ ৭।৩৯ মধ্যে ও ১।১৮ গতে ২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৪৫ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ৩।৩৩ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৬।৫ মধ্যে।

## মুসলিম পঞ্জিকা

**১২ অগ্রঃ,** ভাঃ ৭ অগ্রঃ, **২৯নভেম্বর**, ২০ রবিঃ আউঃ ১২ অঘোন, উঃ ৬।০২, অঃ ৪।৪৬, বৃহস্পতিবার, সপ্তমী রা ঘ ৯।৫০ সেহ্‌রী শেষ ৪।৩৩, ইফতার ৪।৫৬।


মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন


# প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাই পারে একটি দেশ ও জাতিকে সুদূরপ্রসারী ও স্থানীয় উন্নয়ন দিতে ঃ আশু করণীয়

**শিবপ্রসাদ চৌধুরী**



শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা আনে চেতনা। তাই যে কোনও জাতির অগ্রগতির মূল মন্ত্র হল শিক্ষা। শিক্ষা কথাটির বিস্তৃতি বা বিস্তার এত ব্যাপক যে তাকে সংজ্ঞায়িত করা প্রকৃতপক্ষে খুবই কষ্টকর। তবুও বলা যায় মন ও মানসিকতার উৎকর্ষ সাধন করা ও তার প্রকাশই হল শিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধনই হচ্ছে শিক্ষা। এ কথা আমরা সকলেই জানি বা আমাদের দেশ নায়করাও আমাদের দেশের মানুষকে শিক্ষার আওতায় আনার চেষ্টা করেছেন নানাভাবে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকগুলো বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার মানোন্নয়ন, পাঠক্রম, নারী শিক্ষাসহ দেশের মানুষের বিকাশের লক্ষ্যে একটার পর একটা কমিশন চালু হয়েছে। ১৯৪৮ সালে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের সভাপতিত্বে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন---যার পরিচিত নাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসারে কোঠারি কমিশন, ১৯৯৭ সালে গঠিত তাপস মজুমদার কমিটি প্রভৃতি সহ অনেক কমিশন গঠিত হয়েছে।

এটা অনস্বীকার্য যে, একটা দুর্দশাগ্রস্থ জাতির উন্নতি সাধন হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু আমরা হাতে যে সময় পেয়েছি তাও খুব কম নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই যে সমস্ত সরকার ক্ষমতায় এসেছেন তারা শিক্ষা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, কিন্তু কতটা আন্তরিক ছিলেন তা প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মতো একটা পরিকল্পনা কমিশনে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু তা চূড়ান্ত অনুমোদন ও রূপায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি থেকে গেছে। যেমন ১৯৯৭ সালে গঠিত তাপস মজুমদার কমিটির সুপারিশ ছিল ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক শিশু ও কিশোরদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য দশম ও একাদশ পরিকল্পনায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে কিন্তু দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সর্বশিক্ষা অভিযানের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাপস মজুমদার কমিটির সুপারিশ ছিল একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শেষ বছরে অর্থাৎ ২০১৪-১৫ সালে মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে অবশ্যই ব্যয় করতে হবে এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় ৩ শতাংশ। কিন্তু তৎকালীন সরকার জাতীয় যোজনা পর্ষদের হাতে দায়িত্ব প্রদান করেন এবং মাত্র ৩.৮ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দে কোনও কার্পণ্য সরকারের দেখা যায়নি।

অন্যদিকে বিগত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে দেখা গেছে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও বেসরকারি করণ ও উদারীকরণ নীতি গৃহীত হয়েছে এবং শিক্ষাক্ষেত্র ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। এখন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের গৃহীত শিক্ষা নীতির কিছু কথা ভেবে দেখা যাক। দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিব্বল শিক্ষা সংস্কারের জন্য পিপিপি মডেল (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল) করতে কৃত সংকল্প হন। তাতে সমগ্র দেশে একটাই মাদ্রাসা থাকবে, পর্ষদ কর্তৃক দশম শ্রেণির পরীক্ষার ঐচ্ছিককিকরণ। রাজ্যের শিক্ষা পর্ষদগুলির বিলোপ সাধন, জাতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে অভিন্ন পাঠ্যসূচি চালু করা প্রভৃতি বিষয়গুলি ছিল। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একবারও ভেবে দেখলেন না এই সুবিশাল উপমহাদেশে নানা ধর্ম ও নানা ভাষা ও বৈচিত্র নানা সংস্কৃতি যেখানে সেখানে এই নীতি প্রয়োগ করলে কি সার্বিকভাবে বিকাশ হবে? স্বভাবতই প্রশ্ন আছে এই বাণিজ্যিকীকরণ কি তাহলে দেশের মানুষের উন্নতি সাধনের জন্য না শিক্ষায় বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য ভাবনা?

অন্যদিকের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশিষ্ট পণ্ডিত মাননীয় মনমোহন সিং ঘোষণা করেছিলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হবে। তিনি ধাপে ধাপে ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির উপর দেন। তিনি ঘোষণা করেন, ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে আর্থিক সমস্যায় না পড়ে তার জন্য স্কলারশিপ প্রদান ও শিক্ষা ঋণ দেওয়া হবে। কিন্তু সেই সময় এটাও ভাবা উচিত ছিল উদারীকরণের ফলে যেখানে একটি চাকরি পাওয়া আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ পাওয়ার সমান, সেখানে কিভাবে বেকার যুবক-যুবতীরা এই ঋণ শোধ করবে? আর যারা সামান্য বেতনের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তারাই বা কিভাবে এই ঋণ পরিশোধ করবেন। এরপর একবার মুক্তবাজার অর্থনীতির শিক্ষার বাণিজ্যিকী করণের যুগে তাকিয়ে দেখা যাক। ২০১০ সালে এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা ভারতের যতগুলি মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রফেশনাল কলেজ ছিল তার অর্ধেকই ছিল বেসরকারি। ওই সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার ভিত্তি মেধা নয় ক্যাপিটেশন ফি। ফলে মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রবেশাধিকার নেই। বর্তমান সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। যেমন ইউ জি সি, এ আই সি টি ই এবং এম সি আই এর মতো সংস্থাগুলির পরিবর্তে কমিশনের হাতে উচ্চ শিক্ষাকে পুরোপুরি তুলে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার অধিকারে হস্তক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। পাঠ্যসূচিতে এমন কিছু বিষয় আসছে যা কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিহাস বিকৃত করছে বলেও গ্রহণযোগ্যতা কমছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ছে।

যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রযুক্ত নিয়ম মেনে রাজ্য সরকারগুলি শিক্ষণপদ্ধতি রূপায়ন করে তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে সারা দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সে দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বা কোন মহাবিদ্যালয় যাইহোক না কেন সর্বত্রই এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে। যেকোন কারণেই হোক না কেন ছাত্রছাত্রীরা বেশিরভাগই গৃহশিক্ষক বা প্রাইভেট টিউটরের উপর নির্ভরশীল। পরিবারের একটা মোটা অংশ ব্যয় হচ্ছে সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়া শেখাতে। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির নাভিশ্বাস উঠেছে। এরমধ্যে কোনও নিয়োগ না থাকায় বা কোনও নিশ্চয়তামূলক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষিত বেকার হতাশাগ্রস্থ-দিশাহীন। শিক্ষা গ্রহণ করতে ছাত্র-ছাত্রীদের হতাশা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নানাভাবে চরম চাপ বৃদ্ধির ফলে তারা মৌলিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখছে না। গতানুগতিক পদ্ধতির মতো অবস্থা ও স্বচ্ছতার অভাবে অনেক সময় নষ্ট করে পণ্ডিতেরা শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিচালকের আসনে। চটকদারি ও প্রচারমূলক পরিসংখ্যানের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ব্যহত হচ্ছে মেধার অন্বেষণ। ব্যহত হচ্ছে মেধার বিকাশ। এই চরম শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় একথা বলা যায় যে, দল মত নির্বিশেষে শিক্ষানীতি চালু করতে হবে এবং তা কার্যকরী করার জন্য সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে।

যদিও শিক্ষা ব্যবস্থা একটা ধারাবাহিক ব্যবস্থা, পরিবর্তনশীল। তথাপি দেশ নায়কদের মনে রাখা দরকার এক একটি গৃহীত নীতি এক একটা প্রজন্মকে শেষ করে দিতে পারে বা তাদের উন্নত করতে পারে। যার সুদূর প্রসারী ফল পড়ে দেশ, সমাজ ও সভ্যতার উপর। তাই স্থায়ী কর্মসংস্থানের উপর জোর দিতে হবে। মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। কোনও রাজনৈতিক রঙ না রেখে রাজনীতিকে রাজনীতির ময়দানে রাখা দরকার। দেশের প্রধান সম্পদ মানবসম্পদ। মানসম্পদের উন্নয়ন বাদ দিয়ে কোনদিনই কোনও উন্নয়ন স্থায়ী বা দেশের উন্নয়ন হতে পারে না। মানব সম্পদের উন্নয়ন হলে তাদের সচেতন করতে কোনও প্রকল্প ঘোষণা করে দেশের ভান্ডার শেষ করতে হবে। মানুষ নিজেই তার নিজের ভালোমন্দ বুঝে নেবেন। এরজন্য চাই আন্তরিক স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ শিক্ষানীতি। ...তবেই হবে দেশের প্রকৃত সেবা ও দেশের প্রকৃত উন্নয়ন।

# পাশের দেশ - উড়ে এল এক খণ্ড কালো মেঘ

**দীপক রায়**

**পর্ব ১**



পাশের দেশ বাংলাদেশ, যা একদিন আমাদেরই দেশ ছিল, সেখানে চলতি বছরের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পরপর এমন দুটি ঘটনা ঘটে গেল যা আমার কাছে যতটা দুঃখের ততটাই বিস্ময়ের।

আজ থেকে ঠিক দু'বছর আগে ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। ঢাকায় সাতদিন আর চট্টগ্রামে তিন দিন ছিলাম। কয়েকজন কবি সাহিত্যিক শিল্পীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। লেখালিখির সূত্রে দু'একজনের সঙ্গে এখনও সামান্য যোগাযোগ আছে। গত সাতদিনের মধ্যে যে দু'জন মানুষের দুর্ঘটনার কথা এখানের কাগজে পড়লাম, তাঁদের ছবি দেখলাম, তাঁরা কেউ আমার সেই কবি-সাহিত্যিক বন্ধু নয়। অথচ দু'বছর আগে বাংলাদেশ ভ্রমণে তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যোগাযোগ ঘটেছিল। প্রথমজন এই মুহূর্তে আততায়ীর হাতে ছুরিকাহত, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দ্বিতীয়জন একজন বীরাঙ্গনা নারী, যিনি প্রয়াত হলেন। প্রথমজন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সাহিত্যিক জাফর ইকবাল। দ্বিতীয়জন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক নিগৃহীতা নারী ও ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী।

মুক্তিযুদ্ধের আগুন থেকে উঠে আসা এই দু'জন মানুষকে কীভাবে ওই স্বল্প সময়ে জেনেছিলাম—আর কীভাবে ওই দু'জন মানুষ স্বল্প সময়ের জন্য আমার আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন সেই কাহিনী বলি।

**জাফর ইকবাল**

কিছুতেই সময় করে উঠতে পারছিলেন না তিনি। এদিকে বাংলদেশ থেকে আমাদের ফেরার সময় হয়ে এল। একটা সাক্ষাৎকার দেবার জন্য কথা হয়ে আছে। কিন্তু সময় আর বের করতে পারছেন না তিনি। সাক্ষাৎকার নেবেন আমার ভ্রমণসঙ্গী তরুণ প্রকাশক মারুফ হোসেন। আর যিনি তা দেবেন, তিনি হলেন এই সময়ের জনপ্রিয় কিশোর-সাহিত্যিক ইকবাল সাহেব। শিশু ও কিশোরদের জনপ্রিয় লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। কল্পবিজ্ঞানের রচয়িতা হিসেবেও প্রভূত নাম করেছেন তিনি। ঢাকার বইমেলা চলে গোটা ফেব্রুয়ারি মাস ধরে। কলকাতার মতো ১২/১৩ দিনের নয়। জাফর ইকবালের জনপ্রিয়তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যে স্টলে বসে তিনি স্বাক্ষরকারীর দাবি মেটান, সেখান থেকে তাঁর তরুণ পাঠক-পাঠিকার যে দীর্ঘ লাইন পড়ে তা দেখে অবাক হতে হয়। চিত্রতারকার চেয়ে বেশি জনপ্রিয় তিনি। ঢাকার বাইরে তাঁর জনপ্রিয়তার চাপে কোনও একটি অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। তিনি আবার খ্যাতনামা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের ভাই। জনপ্রিয়তায় তিনিও ইকবাল সাহেবের চেয়ে কম নন। ঠিক এই সময়ে তাঁর সময় পাওয়া কষ্টকর বইকী। তবুও ফেরার আগের দিন, ২৭ ফেব্রুয়ারি বিকাল চারটেয় তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলাম।

অনেক জ্যামজট পার হয়ে খানিকটা হেঁটে যাবার পর পৌঁছালাম ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার এক সুরক্ষিত এলাকায়। এখানেই একটি সুরক্ষিত ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি। রক্ষীর নজরদারি আর জিজ্ঞাসাবাদ পেরিয়ে আমরা যখন তাঁর কাছে গেলাম, তখন নির্দিষ্ট সময় কিছুটা পার হয়ে গেছে। তাঁর জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই, কিন্তু এত ঘেরাটোপ কেন? কেন এতো সিকিউরিটির বেষ্টনী তাঁকে ঘিরে? মনের ভিতরে প্রশ্ন ছিল, কিন্তু এখনই তা জানার কোনও উপায় ছিল না। সৌজন্যমূলক দু-চার কথা বলার পরই মারুফ তার ক্যামেরা আর টেপরেকর্ডারের সাহায্যে সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু করল। প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলল এই সাক্ষাৎকার পর্ব। এখানে আমার কোনও ভূমিকাই ছিল না, আমি তাঁর সঙ্গী ছিলাম মাত্র।

ক্যামেরা ও শ্রবণযন্ত্র বন্ধ হল যখন, তখন আমাদের কথোপকথন অন্যভাবে শুরু হল। জাফর ইকবাল এখন যেমন আছেন তেমন ছিলেন না সেদিন। একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ গোটা দেশটাকে ওলটপালট করে দিয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে খুন হয়েছিলেন জাফর ইকবালের বাবা। চাকরি সূত্রে বাবা বড়ো অফিসার ছিলেন। কিন্তু বাবার অকালমৃত্যু নিমেষে জাফরের পরিবারকে একেবারে চুরমার করে দেয়। সেনাবাহিনীর ভয়ে গৃহত্যাগ করতে হয় তাঁদের। কোথাও তাঁদের স্থান হয় না। ভরসন্ধ্যায় মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে নৌকার ওপর বসে আছেন। নৌকা ছাড়ার পর মাঝি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা যাবেন কোথায়। কোনও উত্তর জানা নেই তাঁদের। এ বিষয়ে জাফরের আত্মজৈবনিক একটি লেখা উল্লেখ করি---'ভয়াবহ একাত্তর তখন, চারিদিকে মৃত্যু ওঁত পেতে আছে, নদীর কালো পানির দিকে ভালো করে তাকালে একটি দুটি মৃতদেহকে ভেসে যেতে দেখা যায়, তার মধ্যে সদ্য স্বামীহারা একজন জননী তাঁর সন্তানদের বুকে আগলে ছোটো একটা নৌকায় অনিশ্চিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কোথায় যাবে জানে না, এর থেকে মর্মান্তিক দৃশ্য আর কী হতে পারে? আমরা নৌকায় বসে আকাশের দিকে তাকালাম, পানির দিকে তাকালাম, নদীতীরে গ্রামের দিকে তাকালাম, দেখতে দেখতে আমাদের সবার কেমন জানি বয়স বেড়ে গেল।....' **ক্রমশ**

## সম্পাদক সমীপেষু

### ভালো লাগে, আজ বহু মানুষ কলম ধরেছেন

বর্তমানে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে, সেটা হল, বহু মানুষ কলম ধরেছেন আবার নতুন করে। অনেকেরই মনের একটা ইচ্ছা থাকে। প্রত্যেকেই ভাবেন, যদি আমার লেখা প্রকাশ পায়। তাই জড়তা কাটিয়ে আজ বহু মানুষ কলম ধরে অনেক কথা, অনেক গল্প, অনেক অজানা কাহিনী তুলে ধরছেন। আর সেইসব কলমবাজদের লেখাগুলোতেও প্রকাশ পাচ্ছে অজানা নানান ঘটনা। তাই পত্রিকার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি। একটা পত্রিকা (খবরের কাগজ) তার কত দাম, সেটা দিয়ে বিচার না করে, সেই পত্রিকাতে কি খবর রয়েছে, সেটাই সব থেকে বড় খবর। আজ বাংলা পত্রিকা'র (খবরের কাগজ) সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখানেই বুঝতে হবে, মানুষ খবরের কাগজের ওপর এখনো অগাধ বিশ্বাস রেখে দিয়েছেন এবং প্রত্যহ সকালে কাগজটি না পড়লে মনে হয় কী যেন আজ মিস করলাম। খবরের কাগজ পড়া মানেই অনেক কিছু জানার একটা মাধ্যম। এই মাধ্যম দিনের পর দিন আমাদের পরিষেবা দিয়ে আসছে। আজও একইভাবে পরিষেবা দিয়ে চলেছে। কোন একটা দৈনিক পত্রিকা কয়েক বছর বাদেই শতবর্ষে পৌঁছে যাবে। আর বেশ কিছু দৈনিক পত্রিকা শতবর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তারপরেও তারা একইভাবে আমাদের খবর দিয়ে আসছে। এখানেই একটা খবরের কাগজের কতখানি মূল্য তা বোঝা যায়। নিছক একটা কিনতে হয়,তাই কিনে ফেলি---এটা বোধহয় একদম ঠিক নয়। আমরা একটা খবরের কাগজকে ততখানি মূল্য দিই, যতখানি একটা বইয়ের থাকে। সেই খবরের কাগজ বর্তমানে বহু কলমবাজদের একটা জায়গা দিয়েছে এবং বহু কলমবাজ আজ তাঁদের মনের কথা, যা অন্যকিছুর অর্থমূলক ও ভ্রমণমূলক গল্প তুলে ধরার একটা সুযোগ পেয়েছে। সবার পক্ষে সম্ভব হয় না, কিছু অর্থ দিয়ে তার লেখাটা প্রকাশিত হোক। কিছু মানুষ রয়েছেন, যাঁরা একটা চিঠি লিখে প্রেরণ করেন। সেটাও অনেক কষ্ট করে অর্থ সংগ্রহ করে তবেই পাঠান। তাঁদের এই পত্রগুলো যখন প্রকাশ পায়, একটা আলাদা অনুভূতি এসে যায়। এই জায়গায় সব মানুষকেই সুযোগ দেওয়া উচিত। যে সঞ্চিত হয়েছেন তিনিও থাকুন। যাঁরা নতুনভাবে আসছেন, তাঁরাও যেন বঞ্চিত না হন।এরফলে প্রত্যেকেই তাঁর প্রতিভাকে তুলে ধরতে পারবেন।

**প্রবীর মিত্র**
**হাওড়া**


উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক


**উন্নয়ন ও সমস্যা**

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

## পাঠকের দরবারে




চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com



মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়